OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 149 - 154
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 149 - 154
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

নারী প্রগতি ও মহাশ্বেতা দেবী-র ‘হাজার চুরাশির মা’

ড. ঘনশ্যাম রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ড. মেঘনাদ সাহা কলেজ, ইটাহার, রানিপুর, উত্তর দিনাজপুর
Email ID: ghanashyamroy24@gmail.com
0009-0003-7682-185X

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Mahasweta Devi, Backdrop, Naxalite movement, Liberation decade, Progressive, Lower class, Politics, Society.

Abstract

‘Hazar Churashir Ma’ (Mother of 1084) is a widely read and discussed novel by Mahasweta Devi, published in 1974. Set against the backdrop of the Naxalite movement in West Bengal in the 1970s, this novel explores the impact of the tumultuous era on contemporary society, politics, and family dynamics. Mahasweta Devi portrays the protagonist, Sujata, as a strong and progressive woman navigating her family situation amidst the social turmoil. The novel sheds light on the dark aspects of politics and society during the liberation decade.

The novel's protagonist, Sujata, is devastated by the death of her beloved son, Brati. However, as she navigates her grief, she discovers the circumstances surrounding Brati's death and becomes acquainted with the struggles of the lower-class people involved in his activities. This journey transforms Sujata into a progressive woman, and the article explores this transformation.

Discussion

মহাশ্বেতা দেবীর ‘হাজার চুরাশির মা’ বাংলা কথাসাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। তিনি ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ‘প্রসাদ’ সাময়িক পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যার জন্য প্রথম এই উপন্যাসটি লেখেন এবং পরবর্তীকালে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথমের দিকে এটি বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। বিশ শতকের সাতের দশকে পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে অবলবমন করে এই উপন্যাসটি রচিত হয়। এই উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী একজন সন্তানহারা মায়ের জীবনের করুণ অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন যিনি ১৯৭০-এর দশকে তার পুত্র ব্রতীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর নকশাল আন্দোলনের প্রতি তার পুত্রের প্রতিশ্রুতির কারণ অনুসন্ধান করেছেন। সমকালীন রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ণের পাশাপাশি এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুজাতার মাধ্যমে মহাশ্বেতা দেবী একজন মধ্যবিত্ত নারীর ব্যক্তি-জীবনের সংকট, তাঁর পারিবারিক সম্পর্ক এবং এবং নারীর আত্মপরিচয়ের নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। ব্রতীর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুজাতা তাঁর নিজের জীবনকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছেন। ফলে, এই উপন্যাসটি শুধুমাত্র বিপ্লবীর মৃত্যুর কাহিনি হয়ে না থেকে প্রকৃতর্থেই হয়ে উঠেছে একজন নারীর আত্মসচেতনতার কাহিনি, যা নারী প্রগতি নামান্তর।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 149 - 154
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'প্রগতি' শব্দটি মূলত রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত; রাষ্ট্র চিন্তার ইতিহাসে যারা প্রচলিত অবস্থার পরিবর্তন করে নতুন মতবাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎকর্ষ সাধনে প্রয়াসী হন, তাঁদেরকেই মূলত প্রগতিবাদী বলা হয়। উনিশ শতকে নবজাগৃতির পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠা এবং সমাজের প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের কবল থেকে মুক্ত হয়ে নারীর যে আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই, তাকে নারী প্রগতি বলা যেতে পারে।

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই নারী ও পুরুষ পরস্পর একজন আর একজনের জীবনসঙ্গী হিসাবে তাঁদের জীবন তরণী চালিয়ে আসছে। অথচ এই একুশ শতকে পৌঁছেও এই নারী-পুরুষের সম্পর্ককে ঘিরে নানা মতভেদ ও অনিশ্চয়তা আজও রয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে, সামাজিকভাবে নারী ও পুরুষ ঠিক কীভাবে অগ্রসর হলে মানব জাতির প্রগতি হওয়া সম্ভব ও সহজতর হয় তার সুষ্ঠ ধারণা আজও যেন আমাদের বোধের সীমানার বাইরেই রয়ে গেছে। এই সুষ্ঠ বোধের অভাবের জন্যই একদিকে যেমন স্বাধীনতার নামে নারীকে প্রতিনিয়ত প্রদর্শনীর বস্তু করা হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে নারীর সতীত্ব রক্ষার নামে সমাজে নারীকে পঙ্গু কিংবা অবরুদ্ধ করে তোলা হচ্ছে। আসল কথা, সামাজিক পরিসরে আমরা নারীকে না দিয়েছি শিক্ষা, না দিয়েছি তাঁর প্রকৃত স্বাধীনতা। এমনকি কখনও কখনও আমাদের সমাজ নারীকে শুধু একটি নিকৃষ্ট জীব হিসেবে বিবেচনা করেছে কিংবা নিছক পুরুষের পদসেবিকায় পরিণত করতেই ব্যস্ত থেকেছে। আধুনিক কালেও আমরা দেখছি সামাজিক পরিসরে নারীকে অনেক ক্ষেত্রেই তার উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না বরং তথাকথিত প্রগতির নামে নারীকে ভোগের বা খেলার সামগ্রি করে তোলা হচ্ছে। তার ফলে এতদিন ঘরের ভিতরে বেঁধে রেখে নারীকে যেমন অন্ধ করা হয়েছে, আর এখন তথাকথিত প্রগতির চোখ ঝলসানো তীব্র আলোকে তার চোখকে আরও বেশি করে অন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

জগতে শুধু একাকী নারী কিংবা পুরুষ বিচ্ছিন্নভাবে জীবন ধারণ করে জীবনে কখনও পরম সুখ-শান্তি লাভ করতে পারে না। নারী ও পুরুষের জীবন এমন একটি মধুর ও পবিত্র সম্পর্কে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, সেখানে একজনের প্রতি আর একজনের কোনও কারণে বিদ্রোহ দেখা দিলে পরিণতিতে তা অবশ্যই মানব জাতির অমঙ্গল ডেকে আনবে। তাই শারীর বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও নারী ও পুরুষ প্রকৃতপক্ষে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে সমাজে দীর্ঘকাল পাশাপাশি অবস্থান করে আসছে। আর এই নারী-পুরুষের মিলনের ফলে এবং তাদের পারস্পরিক সহজীবন ধারণের ফলে এই ভিন্নতা তাদের জীবনে অপার আনন্দ ও সুখ বহন করে আনে। আর এ জন্যই নারী ও পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে সব চাইতে বড় কথা হল একজনের ওপর অন্য এক জনের পরস্পর নির্ভরশীলতা। আর এই নির্ভরশীলতা শুধু যে অসহায় বা দুর্বলের নির্ভরশীলতা তা কিন্তু নয়; এর মূল কথা হল একজনের অভাব অন্যের সাহায্যে পূরণ করে নেওয়ার স্পৃহা। এই নির্ভরশীলতা ছাড়া যেমন কখনও কোনও আদর্শ সমাজ গড়ে উঠতে পারে না, তেমনি এর অভাব হলে নারী ও পুরুষের মধ্যে মানবীয় গুণগুলির যথাযথ বিকাশের কোনও সুযোগ থাকে না।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসটিকে সাত-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গে তোলপাড় করা নকশালবাড়ী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচনা করেছেন। এই উপন্যাসে তিনি বিশ শতকের সাত-এর দশককে 'মুক্তির দশক' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই উপন্যাসের নায়ক হল ব্রতী, যাকে তার মা সুজাতা চট্টোপাধ্যায় ব্যাকুলচিত্তে কামনা করে জন্ম দিয়েছিলেন। সুজাতা চট্টোপাধ্যায়ের অত্যন্ত আদরের সন্তান ছিল ব্রতী— যে মুক্তির দশকে এক হাজার তিরাশি জনের পর চুরাশি নম্বর শহীদ হয়েছেন। ব্রতীর মৃত্যুর পর মর্গের সংখ্যার হিসেবে তার লাশ দেখতে কাঁটাপুকুরে গিয়েছিলেন তার মা সুজাতা চট্টোপাধ্যায়। ব্রতীর বাবা দিব্যনাথ চট্টোপাধ্যায় সেই সময় সুজাতার সঙ্গ না দিয়ে বরং তাঁর ছেলের কলঙ্কিতভাবে মৃত্যুর ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য নানাভাবে দড়ি টানাটানিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ তিনি চান নি ব্রতীর সঙ্গে সম্পর্ক প্রমাণিত হওয়ার পর কোনওভাবে তাঁর সামাজিক সম্মানহানি ঘটে। তার একবারও মনে হয়নি যে বাবা হিসেবে সেই সময়ে কাঁটাপুকুরে যাওয়াটা তা যে-কোনও কাজের থেকে বেশি জরুরী ছিল। অথচ তিনি সুজাতাকে কাঁটাপুকুরে যাওয়ার জন্য তার বাড়ির গাড়িটিকেও ব্যবহার করতে দেন নি। প্রকৃতপক্ষে সেদিন থেকেই সুজাতার অন্তরে ও চেতনায় ব্রতীর বাবার মৃত্যু ঘটেছিল। তাই দেখা যায় ঘটনার পরের দিন খবরের কাগজে চারটি ছেলের মৃত্যুর খবর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 149 - 154
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রকাশিত হলেও সেখানে ব্রতীর নাম প্রচারিত হয় নি। শুধু তাই নয়, ব্রতীর মৃত্যুর পরও দিব্যনাথ নানাভাবে ব্রতীকে তার জীবন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছেন। এই ঘটনায় সুজাতা একেবারে অবাক হন নি; নতুন করে আর দুঃখ পান নি। দিব্যনাথের পরিবারে সুজাতার পারিবারিক অবস্থান ছিল নেহাৎ একজন স্ত্রী, মা এবং একজন গৃহিণীর। তার স্বামীর পরিবারে তার ব্যক্তিস্তত্তা বা তার নিজস্ব মতামত প্রকাশের কোনও অধিকার ছিল না। তাই তিনি দিব্যনাথের সাথে নতুন করে বিবাদে না জড়িয়ে অবসন্ন মনে ব্যাঙ্কে কাজ করতে চলে গেছেন। কারণ তার পরিবারে তিনি একজন সাধারণ, নীরব ও প্রান্তিক মানুষ ছাড়া অন্য কেউ নন। শুধু তাই নয়, ব্রিতীর মৃত্যুর পর সুজাতা ব্রতীর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তার জীবনের অজানা দিকগুলিকে খোঁজার চেষ্টা করেন এবং একজন সচেতন মা হিসেবে নিজেকে আবিষ্কার করেন। সুজাতার এই আত্মোপলব্ধিকে আমরা নারী প্রগতির প্রথম ধাপ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি যেখানে তিনি নিজেকে শুধু অন্যের মা কিংবা স্ত্রী হিসেবে নয়, নিজেকে একজন স্বাধীন সত্তা হিসেবে আবিষ্কার করেছেন।

অন্যদিকে, সুজাতার রক্ষণশীল পারিবারিক পরিসরে তার স্বামী দিব্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন মধ্যবিত্ত পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিনিধি। তিনি ছিলেন প্রকৃতই একজন পাঁড় লম্পট। সুজাতার শাশুড়িও তাঁর পুত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সবকিছুই আগে থেকে জেনেও কোনওদিন প্রতিবাদ করেননি। সুজাতার অন্য ছেলে-মেয়েরাও তাদের বাবার নানা অপকর্ম সম্পর্কে জেনেও তাদের মা সম্পর্কে তাদের বাবার যাবতীয় আচরণকে 'পৌরুষের প্রকাশ' হিসেবে মেনে নিয়েছে। সুজাতার পরিবারে পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্বের তুলনায় সুজাতার সামাজিক অবস্থান ছিল নিতান্ত গৌণ। সুজাতার দাম্পত্য জীবনে যে অসন্তোষ ও অবদমন ছিল ব্রতীর মৃত্যুর পর তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাছাড়া, সুজাতার মেয়ে নীপাও ছিল তার বাবার মতোই বহুগামী এবং আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, এরকম একটি বিষয় গোচরে আসার পরেও নীপার স্বামী সেটিকে দিব্যি মেনে নিয়েছে। আবার অন্যদিকে, সুজাতার অন্য এক মেয়ে তুলির বিয়ে হচ্ছে টোনি কাপাড়িয়ার সঙ্গে যার মা মিসেস কাপাড়িয়া আসলে একজন গুরুবাদী মহিলা। এই মিসেস কাপাড়িয়ার দৃষ্টিতে স্বামী বা গুরুর কথাই হল জগতের সমস্ত সংকটের একমাত্র সমাধান। তাই জাতের সমস্যা দূর করতে গিয়ে তুলি ও টোনির বাগদান অনুষ্ঠানে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে তিনি বলেছিলেন যে, কেউ নিজের জাতি ও ভাষার মানুষকে বিয়ে করতে না পারলেই নাকি জাতের সমাস্যার সমাধান হয়ে যায়। আবার তুলি ও টোনির বাগদানের দিনই ছিল সুজাতার পুত্র ব্রতীর জন্মদিন। সেই বাগদান পার্টিতেই প্রসঙ্গক্রমে ব্রতীর কথা উঠলে তাকে 'মিসগাইডেড' বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। সুজাতা বুঝতে পারেন যে, তার স্বামী ও পরিবার তাকে নৈতিকতার কথা বললেও তার মধ্যে নিহিত রয়েছে নারীর প্রতি অসম সম্পর্ক এবং পুরুষের শ্রেণিস্বার্থ। সুজাতা তাই নিজেকে শুধু স্ত্রীর ভূমিকায় আবদ্ধ না রেখে পুরুষের প্রতি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। বলা বাহুল্য, তার এই প্রতিবাদ কালক্রমে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের বাঁধন ভাঙার প্রতিবাদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

কিন্তু সাত-এর মুক্তির দশকে ব্রতী, সমু, লাল্টু ও পার্থরা কেন উগ্রপন্থায় বিশ্বাসী হয়ে উঠল বা ব্রতী কেন হত্যা করে আদর্শ প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুকে পড়ল? ব্রতীর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করয়ে গিয়ে সুজাতার জবানীতে মহাশ্বেতা দেবী এই উপন্যাসে তার কিছু উত্তরের আভাস দিয়েছেন। ব্রতী, সমু, লাল্টু ও পার্থদের জঙ্গী হওয়ার অনেকগুলি কারণের মধ্যে পরিবারের শিথিল বন্ধন, মা-বাবার দাম্পত্য সংকট, আশেপাশের মানুষের নৈতিক অধঃপতন প্রভৃতি ঘটনা দায়ী ছিল। এ ছাড়া ব্রতীরা তাদের কর্মকাণ্ডে একই সঙ্গে বহুজনকে বিশ্বাস করেই শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করেছিল। তারা যাদের বিশ্বাস করেছিল তাদের মধ্যে অনেকের কাছে যে চাকরি, নিরাপত্তা ও সুখী জীবনের প্রলোভন বড় হতে পারে এটা তারা কোনওভাবে বুঝতে পারেনি।

> "একটা বিশ্বাস ওকে, ওদের অন্ধ করে দিয়েছিল। ওরা বোঝেনি যে-ব্যবস্থার সঙ্গে ওদের যুদ্ধ, সে-ব্যবস্থা জন্মের আগেই বহুজনকে ভ্রূণেই বিষাক্ত করে দেয়।"[১]

এরই সঙ্গে এই উপন্যাসে ব্রতীর তুলনায় একেবারে হতদরিদ্র ঘরের সমু-পার্থদের কথা এসেছে। একই পার্টির ছেলে হিসেবে, নিজের পার্টির ভেতরকার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে এদের মধ্যে কয়েকজন তরুণ বিরোধীদের হাতে নিহত হয়েছে। তাদের চারজনের নাম খবরের কাগজে ছাপা হয়ে বের হয়, কিন্তু অবস্থাপন্ন ও বড়লোকের ঘরের সন্তান হওয়ার জন্য

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 149 - 154
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ব্রতীর বাবা দিব্যনাথ অনেক দৌড়াদৌড়ি করে তার পুত্রের নাম খবরের কাগজে বের হওয়া আটকে দিয়েছেন। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে মহাশ্বেতা দেবী সমকালীন সমাজের শ্রেণি আধিপত্যের দিকটিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসে ব্রতীর মৃত্যুকে একটা বেদনার চাদরে মুড়ে তার মা সুজাতাকে আমরা দিনযাপন করতে দেখি। একদিকে প্রবল কর্তৃত্ববাদী, অন্যদিকে লম্পট স্বামীর বিপরীতে নিজের প্রতিবাদ নিজের মতো করে জারি রেখেছিলেন সুজাতা। তাঁর এই প্রতিবাদের সঙ্গীও ছিল পরিবারের মধ্যে একমাত্র ব্রতী। ব্রতী সংস্কৃতি চর্চা করতো, কবিতার কাগজ বের করতো; সে নন্দিনী নামে একটি মেয়েকে ভালবাসত। এই ব্রতীরা 'খতমের লাইনে' কেন চলে গিয়েছিল? কেন তাকে নিশ্চিন্ত আরামের পারিবারিক জীবন টানলো না? কেন সে তার শ্রেণি থেকে অনেক নীচে থাকা আরও কিছু তরুণের সঙ্গে ভিরে গিয়ে সমাজ বদলের সশস্ত্র পথ বেছে নিলো? তাদের সঙ্গে সুখী পরিবারের ছেলেরাও ছিল, কিন্তু তারাও প্রাণ দিল। মহাশ্বেতা দেবী সুজাতা চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে সমগ্র উপন্যাস জুড়ে এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন এবং তা করতে গিয়ে আমাদের সামনে সমাজের যে ছবি তুলে ধরেছেন সেই সমাজটা আসলে ভেতরে ভেতরে সমস্ত মূল্যবোধ হারিয়ে গলে পচে দুর্গন্ধময় হয়ে গেছে; বাইরে এর চকচকে ভাব দেখা গেলেও এর ভিতরে ছিল এক ভয়াবহ ক্যান্সার। তাই সুজাতা বার বার এই ভয়াবহ সমাজের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে সমকালীন বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করেছেন।

সুজাতা চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত বড় ও রুচিশীল ঘরের মেয়ে। তাঁর বাবা তাঁকে লরেটো কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করিয়েছেন শুধু কোনও সম্পন্ন ঘরে বিয়ে দেওয়ার জন্য। তাই তিনি বড় ঘরের ছেলে দিব্যনাথের অবস্থা খারাপ জেনেও তার সঙ্গে সুজাতার বিয়ে দিয়েছিলেন কারণ তার বাবা মনে করেছিলেন যে, এই দিব্যনাথ জীবনে একদিন অনেক ওপরে উঠতে পারবেন। প্রথম দিকে সুজাতাও তাঁর স্বামীর বাড়ির স্বচ্ছলতা ও নিরাপত্তায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে সুজাতার অবস্থান ছিল নেহাতই অনুগত, অনুগামী, নীরব ও অস্তিত্বহীন একজন সাধারণ নাগরিকের মতো— সেখানে শুধু দিব্যনাথ ও তাঁর মা-ই পরিবারের সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখতেন। সেখানে সুজাতার অবস্থান নিতান্ত মূল্যহীনের মতো। তাই তাঁর শাশুড়ি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন সুজাতা নিজের জন্য একখানা কাপড় কেনার কথাও কোনওদিন ভাবতে পারেন নি, সেই অধিকার তাঁর ছিল না।

সুজাতার স্বামী দিব্যনাথের সি. এ. অফিসে একসময় একটা চূড়ান্ত টালমাটাল অবস্থা চলছিল, সেই সময় সুজাতা সাংসারিক প্রয়োজনেই ব্যাঙ্কের চাকরিতে যোগদান করেন। তার ছেলে ব্রতীর বয়স তখন সবে তিন বছর। সুজাতা ব্যাঙ্কের এই কাজটা পেয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব যোগ্যতায় অর্থাৎ তাঁর বংশ কৌলিন্যের জোরে; তাঁর অভিজাত চেহারা ও বিশুদ্ধ ইংরাজি উচ্চারণের জোরে। তিনি যখন কাজে বেরিয়ে যেতেন তখন তিন বছরের ব্রতী তাঁর হাঁটু জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলত—

"মা তুমি আজ আপিসে যেও না, আমার কাছে থাক।"[২]

তাই দিব্যনাথও তাঁকে বার বার বলেছিল চাকরি ছাড়তে। কিন্তু সুজাতা প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন বলেই সন্তানের প্রতি সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করেও ব্যাঙ্কের চাকরিটি ধরে রেখেছিলেন। কারণ সেই সময় নিজের মতো করে একান্ত একটা জীবন খুঁজে পাওয়া সুজাতার কাছে অত্যন্ত দামী হয়ে উঠেছিল। আবার ব্রতীর প্রতি সুজাতার দুর্বলতা লক্ষ্য করে দিব্যনাথ ব্রতীকে ভাবত 'মাদার্স চাইল্ড'। অন্যদিকে ব্রতীও তার বাবাকে তার নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শ অনুসারে শ্রেণি শত্রু মনে করত। সাত-এর দশকের নব্য তরুণ হিসেবে ব্রতী মনে করত যে পথ ধরে সমাজ ও রাষ্ট্র চলছে, সে পথে মুক্তি আসবে না। তাই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাস হারানো ব্রতী সমাজকে পরিবর্তনের নেশায় এক সময় নিজেকে আমূল বদলে ফেলেছিল। তার এই বদলে যাওয়ার ব্যাপারটা সুজাতা লক্ষ্য করলেও তখন ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেন নি। পরবর্তীকালে, ব্রতীর মৃত্যুর পর তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ব্রতীর নিজের হাতে লেখা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বয়ান দেখার পর সুজাতা নারীর স্বভাব সুলভ সুখী গৃহকোণের বৃত্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং পরিচিত হলেন মুক্তির দশকের অগ্নিগর্ভ এক সামাজিক অবস্থার সঙ্গে।

'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে মহাশ্বেতা দেবী নিম্ন শ্রেণির মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সুজাতা। সমগ্র উপন্যাসে তাঁকে একজন কঠোর মানসিকতার নারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 149 - 154
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ব্রতীর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সুজাতা সাত-এর দশকের অগ্নিগর্ভ আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। তিনি পরিচিত হন সমুর মা ও দিদির সঙ্গে। সমুর দিদিকে তার পিতা ও সমুর মৃত্যুর পর অনোন্যোপায় হয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে ছাত্র পড়িয়ে সংসার চালাতে হয়। সমুর মায়ের কাছ থেকে সুজাতা জানতে পেরেছিলেন লাল্টু-বিজিত-পার্থদের কথা। সমাজে প্রভূত সামর্থ ও সম্ভাবনা থাকলেও এরা এক সময় একটা কাজের জন্য পাগল হয়ে ছুটে বেরিয়েছে, কিন্তু কোথাও কোনও একটা কাজ তারা খুঁজে পায় নি। সমাজে বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার লাভ করতে না পেরে এরা তাই সেই সময় সমাজ ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল এবং বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। এরা চেয়েছিল সামাজিক মুক্তি, ব্যক্তির মুক্তি। তাই তারা গোপনে সশস্ত্র আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিল। মহাশ্বেতা দেবী এই আন্দোলনের পটভূমি হিসেবে উল্লেখ করেছেন—

> "অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধেই নকশালবাড়ির কৃষকশ্রেণী একদিন সংগঠিত শক্তি নিয়ে বিদ্রোহের পক্ষে নামেন। সে-আন্দোলন একই প্রকারে বঞ্চিত-শোষিত কৃষককে অন্ধ্রে, কেরলে, তামিলনাড়ু বিহার ও ওড়িশায় প্রেরণা যুগিয়েছিল নাকশাল্বাড়ি আন্দোলন নামে যা অভিহিত, তাকে বহুনামে আখ্যাত করা হয়েছে, এবং সমগ্র ব্যাপারটির মুকাবিলা কীভাবে করা হয়েছে তা সকলেই জানেন। ঘটনাটিকে অতিবাম-বিচ্যুতি, কেতাবী ও অত্যুৎসাহী তরুণদের ফ্রাস্ট্রেশন, অন্যান্য শক্তি ও প্রসাদপুষ্ট ব্যাপার, যাই হোক না কেন কিছু সত্য থেকে যাচ্ছে। যে যে কারণ থেকে এ আন্দোলন উদ্ভূত তা অক্ষুণ্ণ আছে...।"[৩]

সমুর মায়ের সঙ্গে পরিচয়ের সময়ে সুজাতা প্রথম জানতে পারেন যে ব্রতী ঘটনার দিন সমুদের বাড়িতে এসেছিলেন সমুদের সাবধান করতে এবং তা করতে এসেই সে তার নিজের প্রাণটা হারিয়েছে। সমুর মা, সমু ও ব্রতীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই তিনি এক সময় ব্রতীকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন –

> "তুমি কেন এমন কইরা হকল জলাঞ্জলি দিতেছ ধন! কি নাই তোমার? সভাউজ্জুল বাপ, বিদ্বান মা। হে কইতো না কিছু। শুধা হাসত। আর হাসিখানা আমার চক্ষে নি ভাসে দিদি।"[৪]

আসলে ব্রতী ও সমুদের আন্দোলন যে সফল হওয়ার নয়, তা যেন সমুর মা প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি ব্রতীকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু ব্রতী কি করে বদলে গেল, সুজাতা তা অনুধাবন করতে পারেন নি। ব্রতীর মৃত্যুর কারণ খুঁজতে এসে সুজাতা এই শ্রেণিবিন্যস্ত সমাজের ভেতরের রাজনীতির কথা জানতে পারেন। ব্রতী ছিল শ্রেণিবিন্যস্ত সমাজের ভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধি, ধনী পরিবারের ছেলে। তাই সমু ও পার্থের মতো সমস্যা তার না থাকলেও তার মায়ের প্রতি তার বাবার আচরণ ও সামন্ততান্ত্রিক ঔদ্ধত্য তাকে শ্রেণি সচেতন হতে উদ্দীপিত করেছিল। নন্দিনীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সুজাতা জানতে পারেন ব্রতীর বাবার প্রতি ব্রতীর এই বিরূপ মানসিকতার কথা। ব্রতীর বাবা যে ব্রতীর সাথে প্রকৃতপক্ষে কোনওদিন পিতা-পুত্রের মতো সম্পর্ক গড়তে চেষ্টা করেন নি এবং সুজাতাকেও তিনি যে পাপোশের মতো ব্যবহার করতেন— সে কথাও তিনি নন্দিনীর কাছ থেকেই প্রথম জানতে পারেন। এছাড়া সমু-বিজিত-পার্থ-লাল্টুদের দলে ব্রতীর ভিরে যাওয়ার কোনও আশু প্রয়োজন ছিল না। সমু-বিজিত-পার্থ-লাল্টুদের জীবন সংগ্রাম ব্রতীকে সেই সময় প্রচণ্ডভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল। সমুর মতো দরিদ্র বাবা-মায়ের সন্তান, লাল্টুর মতো ভাগ্যপ্রহৃত অপমানিত যুবকদের এবং অন্যান্য সমকালীন সামাজিক মানুষদের জীবনের জ্বালা নিজের রক্ত-মাংসে অনুভব করেই শেষ পর্যন্ত মুক্তির দশকে ব্রতীকে হাজার চুরাশি হতে হল। নতুবা জীবনে বেঁচে থাকলে হয়তো ব্রতীও কোনোদিন বিলেত যেতে পারত, বিরাট কোনো চাকরি করত কিংবা সমাজের ওপর তলায় উঠে যেত বিনা প্রচেষ্টায়।

মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসে আর একটি ব্যতিক্রমি চরিত্র হল নন্দিনী। ব্রতী নন্দিনীকে ভালোবাসত। এই নন্দিনী ছিল সাত-এর দশকের তথাকথিত উগ্রপন্থায় বিশ্বাসী ও ব্রতীর সমস্ত কর্মকাণ্ডের সহযোগী। কিন্তু এই নন্দিনী শুধু একজন প্রেমিকা মাত্র নয়, তার নিজের রাজনৈতিক অবস্থান ও তার জীবন অভিজ্ঞতা নিয়ে নন্দিনী সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে। এই উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী সাত-এর দশকের নকশাল আন্দোলনের দমন-পীড়ণের ঘটনাকে অবলম্বন করে সমকালীন রাজনৈতিক সহিংসতার অনেক প্রশ্ন পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। এখানে তিনি শুধু 'মিসগাইডেড' বিপ্লবীদের ইতিহাস রচনা করেননি। এই বিপ্লবীদের নৃশংস মৃত্যু যে তাদের মায়েদের,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 17
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 149 - 154
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তাদের প্রেমিকাদের এবং তাদের পরিবারের অপরাপর সদস্যদের জীবনকে কী গভীরভাবে পরিবর্তন করে দিতে পারে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ঔপন্যাসিক এখানে তুলি ধরেছেন। ব্রতীর মৃত্যুর পর একজন মা হিসেবে এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সুজাতা যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তার সঙ্গে নন্দিনীর অর্জিত অভিজ্ঞতা সরাসরি না মিললেও কোথাও যেন তাদের বিরহি মনের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ তৈরি হয়ে যায় যা তাদেরকে সমকালীন দমনমূলক ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে আরও সচেতন করে তোলে। বলা বাহুল্য, এই নন্দিনী চরিত্রটিকে উপস্থাপন করার মধ্য দিয়ে মুক্তির দশককে ঘিরে মহাশ্বেতা দেবীর রাজনৈতিক মত ও আদর্শের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উপন্যাসের মধ্যে সুজাতাকে কেন্দ্র করে যে নারী প্রগতির ধারণা বয়ন করা হয়েছে, নন্দিনী চরিত্রের মাধ্যমে তা যেন আরও বিস্তার লাভ করেছে। সুজাতা এই নন্দিনীর কাছ থেকেই জানতে পারেন ব্রতীদের সঙ্গে অনিন্দ্যর বিট্রে করার কথা। ব্রতী অনিন্দ্যকে এক সময় বোকার মতো বিশ্বাস করেছিল। কারণ এই অনিন্দ্যকে নিয়ে এসেছিল ব্রতীরই বন্ধু নিতু। অনিন্দ্য যদি বিট্রে না করতো তাহলে হয়তো ব্রতীকে 'হাজার চুরাশি' হতে হত না। ব্রতীর মৃত্যুর পর নন্দিনীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নিতু জেনে-বুঝেই অনিন্দ্যকে এনেছিল কিনা— এই প্রশ্নটিও সুজাতার মনে বারবার জেগেছে। ব্রতীর মৃত্যুর পর তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এভাবেই সুজাতা চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিজের পরিবারের সম্পর্কের অন্তঃসারশূন্যতা, সাত-এর দশকের অস্থির রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার সঙ্গে পরিচিত হন এবং একজন আত্মসচেতন নারী হিসেবে তাঁর আত্মমুক্তি ঘটে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' বাংলা সাহিত্যে নারীর আত্মসচেতনতা, সমকালীন সামাজিক অসংগতি ও রাজনৈতিক সচেতনতার একটি বিশ্বস্ত দলিল। অবশ্য এই উপন্যাসে নারী প্রগতির ধারণাটি কোনও সামাজিক বা রাজনৈতিক তত্ত্বের মতো কোনও বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। বরং এটিকে উপন্যাসের বয়ন-কৌশলের কেন্দ্রীয় চেতনার অন্তর্গত হিসেবে বিবেচনা করা যায়। মহাশ্বেতা দেবী সুজাতা চরিত্রটি শুধু স্ত্রী কিংবা মা চরিত্র হিসেবে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি, নিজের ব্যক্তিগত শোক তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে শেখায়। ব্রতীর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি হন এবং সমকালীন মধ্যবিত্ত পুরুষ-শাসিত সমাজে প্রচলিত দীর্ঘদিনের পারিবারিক নীরবতা ভেঙে নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতার পথ ধরে তিনি নিজের দাম্পত্য-জীবন, তার পরিবার এবং তার সামাজিক অবস্থানকে বিচার করতে শুরু করেন। তাই, 'হাজার চুরাশির মা' শুধু একটি রাজনৈতিক আখ্যান না হয়ে নারীর আত্মপরিচয়, মাতৃত্বের পুনর্নির্মাণ পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ব্যক্তিগত চেতনার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নারী প্রগতির ভাষ্য নির্মাণ করেছে।

Reference:

১. দেবী, মহাশ্বেতা, *হাজার চুরাশির মা,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৩৭
২. তদেব, পৃ. ১২
৩. দেবী, মহাশ্বেতা, *ভূমিকা, অগ্নিগর্ভ, মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র ৮*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৩২৭
৪. দেবী, মহাশ্বেতা, *হাজার চুরাশির মা*। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৩৬

Bibliography:

মণ্ডল, শুভেন্দু, *প্রতিরোধের উপস্থাপন, মহাশ্বেতা দেবী এবং মামণি রয়ছম গোস্বামী*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৬
দেবী, মহাশ্বেতা, *হাজার চুরাশির মা,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪
ঘোষ, নির্মল, নকশালবাড়ি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮২
দেবী, মহাশ্বেতা, বিশেষ সংখ্যা, গল্পসরণি, ষোড়শ বর্ষ, বার্ষিক সংকলন, ১৪১৮
Devi, Mahasweta. *Mother of 1084.* Translated and introduced by Samik Bandyopadhyay. Seagull Books, 1997